প্রতিদিন একটি রুমাল গল্পগ্রন্থের সংযোজন অংশের তিনটি গল্প : মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রসঙ্গ

মোঃ আব্দুল হালিম*

[সারসংক্ষেপ : বাংলা কথাসাহিত্যে মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮) অন্যতম সৃষ্টিশীল গল্পকার। তাঁর গল্পের স্বতন্ত্র বিষয় ও ভাষারীতি বাংলা ছোটগল্পকে অনেক বেশি আধুনিকতার স্পর্শ দান করেছে। একজন গল্পকারের মানসগঠনে তাঁর সমকাল এবং সমকালীন ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। গল্পকার মাহমুদুল হকের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই তো মাহমুদুল হকের অন্যতম *প্রতিদিন একটি রুমাল* (১৯৯৪) গল্পগ্রন্থের সংযোজন অংশের 'কালো মাফলার', 'গরু-ছাগলের গল্প' ও 'বেওয়ারিশ লাশ' গল্প তিনটি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধকালীন বাঙালি জনজীবনের স্পন্দনটিকে আত্তীকরণ করতে পেরেছে। মূলত এই তিনটি গল্পের প্রধান বিষয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তরে পাকবাহিনী ও এদেশীয় স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির অত্যাচার, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, জনজীবনে ভয় ও আতঙ্কের সর্বগ্রাসী বিস্তার, সাধারণ মানুষের অসহায়ত্ব এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ও নিগৃহীত হবার ঘটনাগুলোর যথাযথ উপস্থাপন এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।]

এক.

মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের জমানায় এক সৃষ্টিশীল গল্পকার। একজন জাত সাহিত্যিক যখন কিছু সৃজনের জন্য হাতে কলম তুলে নেন, তখন অন্বিষ্ট সৃষ্টিকর্মটি পরমভাবে সৃজিত হয়। বাংলা কথাসাহিত্যে মাহমুদুল হক ঠিক তেমনি একজন জাত সাহিত্যিক। উপন্যাস কিংবা ছোটগল্প নানাবিধ সাহিত্য-রূপ সৃষ্টিতে তিনি দেখিয়েছেন অতুলনীয় নৈপুণ্য। বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পগুলোতে অসামান্য শৈল্পিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটগল্পগুলোর কাহিনি ও ভাষার ব্যতিক্রমধর্মিতা তাঁর স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যকে পাঠকের সামনে যথোপযুক্তভাবে তুলে ধরে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, গ্লানি, অস্তিত্বসংকট, ভয়, নৈরাশ্য, হতাশা, সমকাল, সমাজের গভীরতর ক্লেদ, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং বাঙালির মহান আত্মত্যাগ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর ছোটগল্পগুলোতে স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, ছোটগল্পের ব্যতিক্রমী বিষয় ও ভাষা নির্মাণে মাহমুদুল হক অনেক বেশি আধুনিকতার পরিচয়বাহী। মাহমুদুল হকের ছোটগল্প প্রসঙ্গে স্মর্তব্য সমালোচকের মন্তব্য :

> তাঁর গল্পে অন্বিত ভাষা নিছক কোনো সৌন্দর্যের প্রহেলিকা সৃষ্টি করেনি, বরং নিটোল কাহিনির অস্থি-মজ্জায় ও হৃৎপিণ্ডে তিনি যে শব্দপুঞ্জ সঞ্চারিত করেছেন তা গল্পকে লক্ষ্যভেদী, হৃদয়গ্রাহী, প্রসাদগুণসম্পন্ন, নান্দনিক করার অভিপ্রায়ে। এই গদ্য আয়ত্ত করতে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার আত্মমগ্ন অঙ্গীকারে। তাঁর গল্প কাহিনি এবং ভাষার স্বতন্ত্র অন্তর্বয়নে আধুনিকতার অনন্য স্বরগ্রাম। (আবু হেনা, ২০২১ : ১১৮)

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা–২৪০০

বাংলা কথাসাহিত্যে মাহমুদুল হকের আবির্ভাব ঔপন্যাসিক হিসেবে হলেও তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলোতে এক অসামান্য সৃষ্টিশীলপ্রজ্ঞার সন্ধান মেলে। গ্রন্থ প্রকাশে উদাসীন হলেও ছোটগল্প সৃজনে গল্পকারের পরম আত্মনিষ্ঠায় প্রতিনিয়ত নিজের সৃষ্টিশীলতাকে অতিক্রম করার প্রয়াস দৃশ্যমান। তাঁর *প্রতিদিন একটি রুমাল* (১৯৯৪) কিংবা *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৯) গল্পগ্রন্থে কাঙ্ক্ষিত গল্পকারসত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

> মাহমুদুল হকের সৃষ্টিশীল অন্তর্চৈতন্যের সাফল্য ও শিল্পিত অভিপ্রায় যদিও ঔপন্যাসিক হিসেবে, কিন্তু এই সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার কৃতিত্ব ও কীর্তিময়তা স্পন্দমান হয়েছিল গল্পের অনুশীলনে। দু'টি গল্পগ্রন্থে, প্রতিদিন একটি রুমাল (১৯৯৪) এবং নির্বাচিত গল্প (১৯৯৯), চৌদ্দটি গল্প সংকলিত। অথচ, স্মৃতিচারণিক সাক্ষাৎকারে উল্লিখিত আত্মভাষ্য লিখেছেন প্রায় আশিটি গল্প। গ্রন্থ দু'টি প্রকাশ হয়েছে সাহিত্যচর্চা থেকে যখন তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন নিভৃতে, তারও অনেক বছর ব্যবধানে। গ্রন্থ প্রকাশের বিষয়ে সীমাহীন ঔদাস্য ছিল তাঁর, কিন্তু তিনি যে আত্মনিষ্ঠা ও ক্রমাগত অতিক্রমণের মধ্যে দিয়ে শিল্পের নিটোল, নির্ভার, নির্মেদ সন্দর্ভ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, গ্রন্থবদ্ধ এবং অজস্র অগ্রন্থিত গল্পের পারম্পর্যে তারই চিহ্ন ও চিত্ররূপময়তা উৎকীর্ণ। (আবু হেনা, ২০২১ : ১১৮-১১৯)

একজন সাহিত্যিকের মানস-গঠনে তিনি যে সময়, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন অতিক্রম করেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। মাহমুদুল হকের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ছোটগল্পগুলো সৃজনে তাঁর মনোজগতে সমকাল, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কে সমালোচক আবু হেনা মোস্তফা এনাম বলেন :

> সমাজ ও সময়ের পরিবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত, ব্যক্তির অন্তর্গত নৈঃসঙ্গ্যবোধ, মানবিকীকরণ, আর্থ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ, বিশ্বপরিস্থিতি এবং জাতিগত ঐতিহ্য, ইতিহাস-অন্তর্গত যন্ত্রণাজর্জরিত ঘটনাপুঞ্জ ও অনুষঙ্গে ব্যক্তির যাপিত জীবনপ্রণালি ও শিল্পচিন্তা প্রভাবিত হয়। আলোড়িত করে সংবেদনশীল ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের নির্জ্ঞানস্তর, অনুরণিত হয় শিল্পীর নিমগ্ন হৃদয়লোক। অন্তর্দৃষ্টির অনিবার্য বিন্দুসংহত আকাঙ্ক্ষা ও আধুনিক মনস্কতায় শিল্প হয়ে ওঠে সুদূরস্বপ্নচারী। মাহমুদুল হকের গল্প এই স্বপ্নচারিতা ও শিল্পসৌরলোকের যাত্রা। (আবু হেনা, ২০২১ : ১১৯)

গল্পকার মাহমুদুল হক বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর কিংবা আশির দশকের উত্তাল ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে পথপরিক্রমা করেছেন। ফলত, তাঁর সাহিত্যকর্মে বিশেষভাবে বাঙালি জাতির মহান আত্মত্যাগের আলেখ্য মুক্তিযুদ্ধ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর অন্যতম *প্রতিদিন একটি রুমাল* গল্পগ্রন্থের সংযাজন অংশের 'কালো মাফলার', 'গরু-ছাগলের গল্প' ও 'বেওয়ারিশ লাশ' গল্প তিনটিতে বিভিন্ন অনুষঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালীন নানা প্রসঙ্গ বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। গল্প তিনটিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষতা প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন মানুষের জীবনচর্যায় মাহমুদুল হকের কথাসাহিত্যে বিস্তৃত মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এবং যুদ্ধোত্তরকালে ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের ভয়াবহ বিপর্যয়, ধূসরতা ও বিনষ্টির কাহিনি। 'কালো মাফলার', 'গরু-ছাগলের গল্প', 'বেওয়ারিশ লাশ' গল্পসমূহে মুক্তিযুদ্ধ-প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ। (আবু হেনা, ২০২১ : ১২৪)

প্রত্যেক গবেষণামূলক প্রবন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট ও মৌলিক গবেষণা-ফল থাকাটা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বর্তমান প্রবন্ধে মাহমুদুল হকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই তিনটি গল্পে উপস্থাপিত মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা মুক্তিযুদ্ধকালীন আবহকে উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে।

দুই.

মাহমুদুল হকের *প্রতিদিন একটি রুমাল* গল্পগ্রন্থে সংযোজন অংশের অন্যতম গল্প 'কালো মাফলার'। এই গল্পটিতে মনোয়ার চরিত্রটির চেতনাপ্রবাহের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকালের ধ্বংসাত্মকরূপ এবং তৎকালের এদেশের মানুষের মনোজগতে ভয় নামক বস্তুটির সর্বগ্রাসী বিস্তার, মুক্তিযোদ্ধাদের মহান ত্যাগ ও আদর্শ এবং স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির অপতৎপরতা প্রত্যক্ষ। মুক্তিযুদ্ধকালে এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত আতঙ্কে দিনাতিপাত করেছে। পাকিস্তানি শাসকের অত্যাচার এদেশের মানুষের মনোজগতে এতটাই ত্রাস সৃষ্টি করেছিল যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গ্রহণ-বর্জনের শব্দেও তারা ভয়ে কুঁকড়ে যেত। কিন্তু বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত ভয়কে জয় করে সামষ্টিকবোধে উজ্জীবিত হয়েছে, যা এই গল্পে মনোয়ার চরিত্রটির মধ্যে সুস্পষ্ট। 'কালো মাফলার' গল্পটি প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি :

> কালো মাফলার দ্বিতীয়রহিত; এমনকি বাংলা ছোটগল্পের পারম্পর্যে এ এক আশ্চর্য ও নির্বিকল্প সৃষ্টি। যুদ্ধের মতো বৈনাশিক ও সংহারী কর্মকাণ্ডে ব্যক্তির অস্তিত্বজিজ্ঞাসা কীভাবে বস্তুমুখি সংবেদ ও সম্ভাবনার প্রশ্নে সমগ্র চৈতন্যের আবেগ, ভয়, অন্তর্প্রেরণা পরিবর্তন করে সামষ্টিক বোধে; মনোবাস্তবতার অন্তর্লীন সত্যোপলব্ধি সময়সমষ্টি পরিস্রুত ঘটনারাশির অভিঘাতে কোন মানবীয় পরিস্থিতি সূচিত হতে পারে কালো মাফলার গল্পটি তারই চেতনাপ্রবাহরীতির শিল্পিত উন্মোচন। (আবু হেনা, ২০২১ : ১২৪)

অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ এদেশের মানুষের অন্তর্জগতে যেমন ভয়কে উপস্থিত করেছিল, ঠিক তেমনি ভয়কে জয় করে সমষ্টির সাথে যুক্ত হবার আলেখ্যও রচনা করেছিল যা 'কালো মাফলার' গল্পটিতে স্পষ্টত।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতিকে শোষণ করার জন্য বিভিন্ন রকম পন্থা অবলম্বন করেছিল। রাতের অন্ধকারে নিরীহ, নিরস্ত্র এদেশবাসীর ওপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পরিচালিত নৃশংস হত্যাযজ্ঞ তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে যাওয়া, হত্যা, গুম ও বেয়নেট চার্জ প্রভৃতি অত্যাচারের বাস্তবচিত্র স্পষ্ট এই গল্পে। ফলে, রাত মুক্তিযুদ্ধকালীন এদেশবাসীর কাছে মূর্তিমান আতঙ্কে পরিণত হয়। 'কালো মাফলার' গল্পে মনোয়ার চরিত্রটির উক্তিতে সেই আতঙ্কটি দৃশ্যমান :

> এখন রাত মানে আতঙ্ক, অবিশ্বাস, নিয়তির হাতের পুতুল সাজা। এই যে আজন্ম পরিচিত হাত-পা, চোখ-নাক-কান জীবন, যে কোনো মুহূর্তে অতি সহজেই সবকিছু বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, চোখের পলক পড়তে না-পড়তে সবকিছু অচেনা হয়ে যেতে পারে। এখন রাত মানে ভারি ভারি বুটের শব্দ, রাত মানে সুমসাম গ্রেফতার, অতর্কিত বেয়নেট চার্জ। আতঙ্কিত ভূতগ্রস্ত অসংখ্য মানুষের মতো প্রাণভয়ে ভীত মনোয়ার আপন মন রাতভর হাঁই হাঁই কোদাল

> চালায়। ভৌতিক মূর্ছার ভেতর এঁটেল মাটির মতো চাপ চাপ অন্ধকার সরানো, এই-ই তার একমাত্র কাজ। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৩৯)

আমরা জানি যে, একজন নিরস্ত্র কিংবা অত্যাচারী ব্যক্তি বা শাসকের হাতে ক্ষমতা ও অস্ত্র তুলে দিলে সেই ব্যক্তি কিংবা শাসক অনেক বেশি হিংস্র হয়ে ওঠে। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই, সামান্য বিষয়ে পাকিস্তানি সৈন্য কিংবা কিংবা রাজাকারদের গুলি ছোড়ার প্রসঙ্গটি। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্য কিংবা রাজাকাররা সামান্য বিষয়ে ফায়ার করত। তারা একাত্তরে এদেশবাসীর সাথে মুখের ভাষার চাইতেও অস্ত্রের ভাষা বেশি ব্যবহার করেছে। পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের হিংস্রতা সম্পর্কে এই গল্পে মনোয়ার চরিত্রটির ভাষ্যে :

> অন্ধকারের ওপর একটা সর পড়েছিল, এখন তা তিরতির করে কেঁপে উঠলো; হয়তো তুচ্ছ কারণে ভয় পেয়েছে ছাউনির সৈন্যরা, শরীরকে চাঙ্গা করে নেয়ার জন্য নিছক একটা ফায়ার। আজকাল তো সৈন্যরা এ রকম খামোখা ফায়ার হরদমই করে থাকে। ছাউনির রাজাকাররাও হতে পারে। হয়তো তারাই এখন পাহারায়। অনেকের মতো মনোয়ারও জানে কারণে-অকারণে কীভাবে এদের হাতে নিসপিস করে, এরা সবসময় হয়ে আছে খয়ে-গোখরো, একেবারে দুম করে হাত কল্কে পেয়েছে, গায়ে মাছি বসলেও ক্ষেপে ওঠে, জোরে বাতাস ছুটলেও এদের ইচ্ছে হল্ট বলে তা থামিয়ে দিতে! মনোয়ার দেখেছে, কিছু না পেয়ে উড়ন্ত ঝিঁঝি পোকার দিকে তাক করে ফটাফট গুলি ছুড়ে নিজেদের রসিকতায় এরা কীভাবে হো হো করে হাসে – মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দা বিমান, মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দা বিমান, হেউ! (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৪০)

অর্থাৎ একাত্তরে শাসক শ্রেণি এতটাই নিষ্ঠুর আর হিংস্রতায় পর্যবসিত হয় যে, সামান্য গায়ে মাছি বসলেও ফায়ার করে উল্লাস প্রকাশ করে যার ছবি আমরা মাহমুদুল হকের দৃষ্টিকোণে 'কালো মাফলার' গল্পে দেখতে পাই।

সমাজ ও রাষ্ট্রে কিছু মানুষ আছে যারা পরিবর্তনকে এড়িয়ে যেতে চায়। সকল সময়ে ঝামেলামুক্ত গো-বেচারা জীবনযাপন করতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, নিজের অধিকারের প্রশ্নেও অধৈর্যের পরিচয় দেয়। 'কালো মাফলার' গল্পে মনোয়ার চরিত্রটি এমনি একটি চরিত্র যে সমস্ত কিছুকে রাতারাতি অর্জন করতে চায়। তাই তো মনোয়ার একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে এক ধরনের ফ্যান্টাসির জগতে বিচরণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন মনোয়ারের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকের মাঝে পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাঁরা চেয়েছিল কোনো ধরনের ত্যাগ ও উত্তেজনা ছাড়াই চুপচাপ ও রাতারাতি দেশ স্বাধীন হয়ে যাক। মনোয়ারের উক্তিতে তার প্রমাণ পাই :

> ভেলকিবাজি চাই, রাতারাতি সবকিছু বদলে যাক, গাছের ফুল, ডালের পাখি, নদীর মাছ, সাপ ব্যাঙ ছুঁচো ইঁদুর সবাই একযোগে একটা কিছু করে ফেলুক, রাতারাতি স্বাধীন হয়ে যাক দেশটা। রক্তবৃষ্টি হোক, মাংস-বৃষ্টি হোক, কালো রোদ ঝরুক, সবকিছু হয়ে যাক বিষাক্ত, রাতারাতি স্বাধীন হয়ে যাক দেশ। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৪০)

একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা কিংবা স্বাধীনতাকামী বাঙালি চরম ধৈর্য ও ত্যাগের প্রমাণ দিয়েছিল যার ফল আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রাপ্তি। প্রকৃত অর্থে মহৎ ও বৃহৎ কোনো কিছু প্রাপ্তির জন্য ত্যাগের

পাশাপাশি অসীম সাহস আর ধৈর্যশীল হতে হয়; তা না হলে প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানোটা সম্ভবপর হয় না। কখনো কখনো নতুনকে পাওয়ার জন্য পুরাতনের ধ্বংস অনিবার্য। আর দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কখনো কখনো চরম বিশৃঙ্খল অবস্থাকে অতিক্রম করেই অর্জন করতে হয় কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এই গল্পে তেমনি ধৈর্যশীল আর আশার প্রতীক মুক্তিযোদ্ধা টুলটুল। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রসঙ্গে মনোয়ারের সংশয়ের বিরুদ্ধে টুলটুলের দৃঢ় উচ্চারণ :

> ওসব কথা থাক। কুকুর-বেড়ালের মতো মরে তো আর কোনো লাভ নেই, মরলে মানুষের মতোই মরা উচিত।
>
> কিছু একটা ভেবে মনোয়ার অধীর আগ্রহে ভেঙে পড়ে বলল, সত্যি করে বলতো, শেষ পর্যন্ত দেশ স্বাধীন হবে?
>
> আলবৎ হবে, তবে অনেক সময় লাগবে, আরো অনেক রক্ত দিতে হবে, আরো অনেক ক্ষতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। হয়তো আমরা সবাই থাকবো না, কেউ কেউ থাকবো। এই যা, চুলোয় যাক এসব কথা, তুই কী করছিস এখন, লেখাটেখা? (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৪৫-১৪৬)

অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ধৈর্য ও ত্যাগ খুব গুরুত্বপূর্ণ যা বাঙালি প্রমাণ করতে পেরেছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের অস্ত্রের বিপরীতে বাঙালি জাতির ছিল প্রবল দেশপ্রেম, স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, অটুট আদর্শ ও অদম্য মনোবল। যার ফলে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাঙালি বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ করেনি। কিন্তু সকল সময় সম্মুখ সমরে জয় লাভ করা সম্ভবপর হয় না, কখনো কখনো গেরিলা পথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। তেমনি মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ইউনিট পাকবাহিনীর মনে ভয় তৈরি করতে পেরেছিল। এই গেরিলা ইউনিটের অবস্থান পাকবাহিনী সহজে চিহ্নিত করতে পারত না। ফলে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা হঠাৎ করেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্য সফল অপারেশন চালাতে পারত। এমনি এই গল্পে মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের সফল অপারেশনের তথ্য পাই :

> গত পরশুদিন রাতে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের একটা সাব-স্টেশন উড়ে গেছে, টহলদার সাটলেজ রেঞ্জার্সের জিপগাড়িতে গ্রেনেড পড়েছে, জনৈক মন্ত্রী মহোদয়ের গাড়ির ভেতর বোমা ফেটেছে, বোঝা যায় গেরিলারা হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই, এমনকি দিন-দুপুরে সকলের নাকের ডগায় একটা পুলিশ ফাঁড়িও তছনছ করে দিয়েছে গেরিলারা। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৪১)

সত্যিকার অর্থে প্রতিপক্ষ যখন অধিক শক্তিশালী, তখন গেরিলা যুদ্ধই শ্রেয় যার উদাহরণ ভিয়েতনাম কিংবা কিউবা। ১৯৭১ সালে বাঙালি পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে এই গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েই যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের এই গেরিলা ইউনিটই পাকবাহিনীকে নাজেহাল করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে একাত্তরে। 'কালো মাফলার' গল্পে গেরিলাদের অপারেশনের আরেকটি চিত্র দেখি :

> অনেক দূরে, এক মাইল কী দু'মাইল, কী আরো অনেক দূরে হড়াম করে একটা বোমা ফাটলো, থরথরিয়ে উঠলো গোটা রাত্রিটাই। মেশিনগান চলছে, দু'মুড়ো চিড়খাওয়া রাতে তুমুল অন্ধকার কাচের মতো ঝনঝন করে পড়ছে পোড়ামাটিতে। মনোয়ারের ভাবতে খুব ভালো লাগলো, রেডিও অফিসের একটা ছাত অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় আকাশে লাফিয়ে উঠেছে। (মাহমুদুল,

১৯৯৪ : ১৫৪-১৫৫)

জনগণের মধ্যে ভয়, সংশয় যুদ্ধকালীন সময়ে অন্যতম অনুষঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়েও এদেশীয় কিছু দুর্বল চিত্তের মানুষ ছিল যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সাহস জুটাতে পারেনি; বরং মাঝে মাঝে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে প্রতিনিয়ত। ফলে, এক ধরনের ভয় তাদের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছিল। এমনি সংশয় ও ভয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করি মনোয়ারের মধ্যে : "মুক্তিবাহিনী বিরাট একটা কিছু করছে না কেন, নাকি তেমন ক্ষমতা তাদের নেই! ধুঁকে ধুঁকে কুকুর-বেড়ালের মতো মরতে হবে সবাইকে, শেষ পর্যন্ত তো এমনও হতে পারে" (মাহমুদুল হক, ১৯৯৪ : ১৪১)। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী বাংলা ভূখণ্ডকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। চারিদিকে মৃত্যুর মিছিল ও ধ্বংসস্তূপ দুর্বল চিত্তের এদেশের কিছু মানুষের মন থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস নামক অনুভূতিগুলোকে গ্রাস করে ফেলেছিল। ফলে, মুক্তিযোদ্ধা ও দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে একাত্তরে মনোয়ার শ্রেণির চরিত্রে সংশয় ও হতাশা কাজ করেছে। 'কালো মাফলার' গল্পে তার উল্লেখ রয়েছে :

> দেশ না শ্মশান। চতুর্দিকে ধ্বংসস্তূপ আর ধ্বংসস্তূপ। যে কোনো সংসার, যে কোনো বাগান ছত্রখান করে দিতে পারে সৈন্যরা, ছারখার করে দিতে পারে লোকালয়। বস্তির পর বস্তি পুড়ছে। এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় হুটোপুটি খেলছে লকলকে আগুন। মুক্তিবাহিনী এক পা এগোয় দু'পা পিছায়, একজন সৈন্যকে সুবিধামতো পেয়ে কাবু করে পালায়, তারপর কতোগুলো নাংলা চাষার বেঘোরে প্রাণ যায়। শেষ পর্যন্ত মরে সব ভূত হয়ে যাবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। মুক্তিবাহিনী তো কোন ছার, মনোয়ার ভেতরে গোছায় তাঁর কথা, এখানে-ওখানে লাশের পর লাশ পাহাড় হয়ে আছে, টানা-হ্যাঁচড়া করছে কুকুর, শকুনে ছিঁড়ছে, দাফন-কাফন নেই, সামান্য যে ফিরে তাকানো সাহসে কুলোয় না তা-ও; এর ওপরে বসে স্বাধীনতার বাতুল চিন্তা, মনোয়ার অস্থিরতার চালে পড়ে একটু একটু করে ক্ষেপে ওঠে। এতোসব ম্যাও মুক্তিবাহিনী একা যদি সামলাতে পারতো, 'ধুত্তোরি' বলে মনোয়ার ঘাড়ের নিচের বালিশকে দুমড়ে দেয়। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৪১-১৪২)

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির একদিকে যেমন মুক্তিলাভের স্বপ্ন ছিল, অন্যদিকে ছিল বিভীষিকাময় অবস্থা। একাত্তরে পাকবাহিনী নিরীহ এই বাঙালির ওপর এতটাই অত্যাচার চালিয়েছিল যে, কিছু এদেশীয় জনগণ অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য পাকবাহিনীর সম্মুখে নিজেকে সাচ্চা পাকিস্তানি প্রমাণের চেষ্টা করত। যদি সে কথা উচ্চারণ করা যেত যা পাকবাহিনী শুনতে চায়, তাহলে মাঝে মাঝে হয়ত মৃত্যুর দুয়ার থেকে বেঁচে ফেরা যেত। এক্ষেত্রে পাকিস্তানিরা যেমন হাতিয়ার হিসেবে ধর্মের বাণী ব্যবহার করেছে এদেশবাসীকে দমন করার জন্যে, তেমনি শোষিত মানুষগুলোও কখনো কখনো নরপশুদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য ধর্মের বাণীকে ব্যবহার করেছে। সেই সময় অত্যাচারে মানুষ এতটাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে কখনো কখনো গোপণীয় অনেক কথা পাকবাহিনীর কাছে প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। 'কালো মাফলার' গল্পে মনোয়ারের কনফেসে সেই চিত্রটি দেখতে পায় :

> আমি সব কনফেস করবো স্যার, আমি মুসলমান স্যার, মুসলমান কখনো মিথ্যা বলে না স্যার, মিথ্যে হলো ঝুট, আমার ইমানের জোর আছে স্যার, জিন্নাহ সাহেব বলতেন ইমান, একতা,

> শৃঙ্খলা, ঐ যে বললাম আমার হাত ধরে দৌড়াচ্ছিল আমার বোন মঞ্জু, সেও কালপ্রিট, সে একটি ছেলেকে ভালোবাসে, ছেলেটি পলিটিকস করে, ওর পাল্লায় পড়ে আমার বোন অনেক কুকাম করেছে, নিজের হাতে কাপড় কেটে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্রঅলা পতাকা সেলাই করে ছাতে উড়িয়ে দিয়েছিল মঞ্জু, আমি মিথ্যে বলতে শিখিনি, স্যার, টর্চার বন্ধ করো, ঐ ছোকরার পাল্লায় পড়ে আমার বহেন ঐ কর্মটি করেছিল, কালো পতাকা উড়িয়েছিল আমার ছোট ভাই, জি না টালটাল নয় স্যার, ওর নাম টুলটুল, টিইউএল টিইউএল, টুলটুলই কালো পতাকা উড়িয়েছিল, ওর নাম আগে করিনি কেন, ভুলেই গিয়েছিলাম স্যার, ও যে আমার ব্রাদার ভুলেই গিয়েছিলাম। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৪৩)

এছাড়াও মাঝে মাঝে নির্দোষ মানুষ অত্যাচারী শাসকের মন ভেজানোর চেষ্টা করে কেবল প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য; একাত্তরেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'কালো মাফলার' গল্পে আমরা দেখতে পাই, কনফেস অংশে মনোয়ারও কখনো কখনো ধর্মের অনুষঙ্গ, কখনো মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া ভাইকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন, কখনো পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বাবার আনুগত্য প্রভৃতি বিষয়গুলো উপস্থাপন করে শাসকের মন পাওয়ার চেষ্টা করছে। একাত্তরে শুধু শাসকের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যই এদেশবাসীর মধ্যে এই প্রবণতা দেখা গেছে। এমনকি শাসক শ্রেণি সর্বদা শোষিতের ওপর জোর করে তার কালচার চাপিয়ে দিতে চায়। একটি জাতিকে শোষণের এটি একটি অন্যতম হাতিয়ার। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীও বাঙালির ক্ষেত্রে একই কাজ করেছে। মনোয়ারের কণ্ঠে উচ্চারিত সে সত্য :

> হ্যাঁ স্যার রামপালের কাছাকাছি ভোজবাজির মতো গায়েব হয়ে যায় টুলটুল, ওতে আমাদের কারো কোনো হাত নেই স্যার, না স্যার, এ ব্যাপারে ফাদার– আব্বাজান স্যার একেবারে নির্দোষ, বিশ্বাস করুন স্যার, ইয়েস স্যার খুব সম্ভব তাই স্যার, হ্যাঁ স্যার এজেন্ট ছিল ইন্ডিয়ার, আগে আমাদের কিছুই জানা ছিল না স্যার, আমার ফাদার স্যার আব্বাজান স্যার– জিন্নাহ সাহেবের অ্যাডমায়রার স্যার, জিন্নাহ লিয়াকত আলী সরদার আবদুর রব নিশতার আমির অব কালাবাগ ফিরোজ খান নুন, খটক ড্যান্স, চুঘতাই-এর ছবি, মালকাইতারান্নুম নূরজাহান, কারনাইলজি জানরাইলজি গান, এসব বলতে অজ্ঞান আমার ফাদার, আমাদের নিজস্ব কোনো কালচার নেই স্যার, আমরা আধা-হিন্দু আধা-মুসলমান স্যার, হ্যাঁ স্যার, এখনো গ্রামদেশে অনেকের খতনা হয় না, আমি নিজেই একজন কালপ্রিট স্যার, রোজা-নামাজ করি না, ঈদের নামাজও নয় স্যার, ঈদের দিন দরোজা বন্ধ করে সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমাই, না স্যার মুতেও পানি নিই না স্যার, আমি কনফেস করছি স্যার, আমি কালপ্রিট, টর্চার বন্ধ করো। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৪৩-১৪৪)

যুদ্ধ মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে। ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ কিংবা রাষ্ট্র জীবনের স্থিরতাকে বিনষ্ট করে। মানুষ সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা হর-হামেশাই ভর করেছে। যুদ্ধের অস্থিতিশীল পরিবেশে প্রাণ বাঁচানোর জন্য পরিবারের কে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে, কখনো কখনো সেটাও জানা যেত না। একাত্তরে প্রথম দিকে আক্রমণগুলো শহরকেন্দ্রিক ছিল। ফলে, শহরবাসীরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে যে যার মত গ্রামের দিকে ছুটতে থাকে। তাঁদের ধারণা ছিল গ্রামে

হয়তো পাকবাহিনী হামলা করতে যাবে না। কিন্তু নগরে আগুন লাগলে যেমন ভস্মীভূত হতে কোন কিছুই বাদ থাকে না; ঠিক তেমনি মুক্তিযুদ্ধেও শহর কিংবা গ্রাম কোনটাই রেহাই পায়নি পাকবাহিনীর হামলা থেকে। 'কালো মাফলার' গল্পে আমরা দেখি, যুদ্ধের সময় মঞ্জুকে গ্রামে রেখে আসা হয়েছে এই বিশ্বাসে যে গ্রামে হামলা হবে না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের গ্রামগুলোও যে নিরাপদ ছিল না তার প্রমাণ :

> মঞ্জুকে ডহুরীতে রেখে আসা হয়েছে: মঞ্জুর কথা হচ্ছে কি? কে জানে কতোদিন চলবে এই যমে-মানুষে টানাটানি। কি কোথায় সব ছিটকে পড়লো, সবাই আছে, আবার কেউ নেই, ছাড়াছাড়ি, কোনো রকমে হিঁচড়ে টেনে বেড়ানো, ক্লান্তি শুধু ক্লান্তি। মনোয়ার একটা সিগ্রেট ধরালো। সময় দেখলো আবার। এখন রাত আড়াইটা। ডহুরীর পাশের গ্রামে সৈন্যবাহিনী তুলকালাম কাণ্ড করে গেছে হপ্তাখানেক আগে;, লোকমুখে খবর পাঠিয়েছে মামা, নপাড়ার হাটের মানুষজন গানবোটের চলাফেরা দেখেছে, আজ পাড়াগাঁও আর নিরাপদ থাকছে না। মঞ্জু ঠিক আছে তো? (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৪৪)

অর্থাৎ একাত্তরে শহর বা গ্রাম যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া থেকে মুক্তি পায়নি, তেমনি মুক্তিযোদ্ধা বা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি জাতি অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। মনোয়াররা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সেটাকে নিরাপদ ভেবেছিল। কারণ :

> একটু পড়ে সে বলল, 'তা হতে পারে, কিন্তু এ বাড়ি এখনও অনেক নিরাপদ। বাড়িটা যার দখলে, মানে আমরা যার কাছে থেকে ভাড়া নিয়েছি, সে এ তল্লাটের পাণ্ডাজামাতি, ধেড়ে ধেড়ে রাঘববোয়ালের সঙ্গে ওঠা-বসা আছে লোকটার। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৪৭)

কিন্তু নগরে আগুন লাগলে দেবালয় পর্যন্ত ভস্মীভূত হয়। তেমনি টুলটুলের কাছ থেকে জানা যায়, মনোয়াররা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে কত ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। সে বাড়িটা ছিল একজন নিরীহ স্কুল মাস্টারের যে কিনা দেশে কী ঘটছে সে বিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল না। খুবই সাদামাটা জীবযাপন করত। অথচ সেই স্কুল মাস্টারকে সেই বাড়িতে নির্মমভাবে খুন করা হয়। এমনকি তাঁর লাশ পর্যন্ত পচে-খসে গেছে, তবুও সৎকার করার জন্য ভয়ে কেউ আসতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই চিত্র সর্বত্র পরিলক্ষিত দৃশ্য :

> টুলটুল কিছু একটা ভাবলো, তারপর ফিসফিস করে বললে, কিন্তু এক সময় মোটেই নিরাপদ ছিল না এই বাড়ি; এ বাড়িতেও মানুষ মেরেছে কুত্তারা। লোকটা ছিল একটা সাদামাটা ইস্কুল মাস্টার, দেশে কী হচ্ছে, কী হতে যাচ্ছে তার কিছুই বুঝতো না। উঠোনে এখন যে হাস্নাহেনা গাছটা ঝামরে উঠেছে ঠিক ঐখানে মাটির ওপর লোকটার লাশ পড়েছিল দিনের পর দিন। পচেখসে একাকার, গন্ধে ত্রিসীমানায় ঘেঁষা যেত না এ বাড়ির; শেষ পর্যন্ত লোকটা বোধহয় মাটিতেই মিশে গিয়েছিল, কেউ সৎকার করেনি ভয়ে। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৪৭)

শাসক যখন অন্যায়ভাবে মানুষকে শোষণ করতে চায়, তখন শাসকরা শোষিত শ্রেণির মধ্য থেকে তাঁদের সহযোগী চাটুকার তৈরি করে। মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর ঠিক এমনি চাটুকার শ্রেণি ছিল এদেশীয় কুলাঙ্গার রাজাকাররা। এই রাজাকাররা পাকবাহিনীর অত্যাচারের সহায়ক শ্রেণি ছিল।

এমনকি এরা নিজেরাও বাঙালির ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে। লুণ্ঠন, মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করা, পাকবাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান জানানোর মত অপকর্ম তারা চালিয়েছিল একাত্তরে। এই রাজাকার শ্রেণির উপস্থিতির বিবরণ 'কালো মাফলার' গল্পে টুলটুলের ভাষ্যে উঠে এসেছে এভাবে :

> আসবার সময় পড়বি তো পড় শালা এক রাজাকারের সামনে। একেবারে মুখোমুখি। শালার ব্যাটা শালা আমাকে চেনে এমন ভাব করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। ভেতরে ভেতরে আমার ধুকপুকুনি শুরু হলেও ব্যাটা বুঝতে পারেনি। এক হাঁকড়ানি মারতেই ব্যাটা চোঁচা দৌড় দিয়ে পালালে। এক ফোঁটা যদি মনের জোর থেকে থাকে শালাদের, ঝাড়ু দিয়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত সব মিসকিনকে এনে গায়ে খাকি চাপিয়ে দিয়েছে, এরা নাকি আবার ঠ্যাকাবে, খেলাধুলা আর কি! (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৪৭-১৪৮)

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকের পা-চাটা রাজাকাররাও ছিল বাঙালি। কিন্তু বাঙালি হয়ে আরেকজন বাঙালির ওপর এরা অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে। এইসব কুলাঙ্গারদের প্রতি মনোয়ারের যে ঘৃণা, রাজাকারদের ওপর সমস্ত বাঙালি জাতির ঘৃণাকে প্রকাশ করে :

> তেমন গায়ে মাখে না তারা, এখন আর কোনো গরজ নেই, অথচ উটকো ঝক্কি পাকাতে এদের কোনো জুড়ি নেই, মনোয়ার মনে মনে গাল দেয়, বুদ্ধির ঢেঁকি এক একটা, এনারা নাকি আবার দেশরক্ষা করবেন!
> হুটপাঠ করে চলে যায় রাজাকারের দলটা।
> বাবা বেজায় খুশি। বললে, 'লোকগুলো ভালো ছিল।'
> মনোয়ার বললে, 'ভালো না ছাই, এক একটা রাস্কেল সব।' (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৫২)

এছাড়াও 'কালো মাফলার' গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালে রাজাকারদের কুকীর্তির প্রসঙ্গও উঠে এসেছে :

> অস্পষ্ট একটা শোরগোল শোনা যায় মাঝে মাঝে। কিসের একটা হল্লা, কান পাতে মনোয়ার, স্পষ্ট শোনা যায় না কিছু না, বোঝার কোনো উপায় নেই, হয়তো রাজাকারের বাচ্চারা অকারণে কোথাও হামলা চালিয়ে দাদ তুলছে, মনোয়ার আবার চেষ্টা করে শোনার। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৫৪)

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশে আইনের শাসন ছিল না। পাকবাহিনী ও রাজাকাররা যখন তখন নিরীহ মানুষের ওপর নজরদারি করত। কখনো কখনো অন্যায়ভাবে দরজা ভেঙ্গে মানুষের ঘরের মধ্যে প্রবেশেও দ্বিধা করত না। সেই সময় বাঙালির মন-মর্জি বলে কিছুই প্রাধান্য পায়নি। এককথায় চরম অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী। 'কালো মাফলার' গল্পে দেখি :

> একটু সময় টুকটুক করে দরোজার গায়ে টোকা পড়ে।
> কোই হায় আন্দরমে, দরবাজা খুলিয়ে-
> কেউ একজন, সম্ভবত গ্রুপ লিডারই হবে, খেঁকিয়ে উঠলো, 'আব্বে এই দরবাজার বাচ্চা দরবাজা, হউর বাইতে আইছ, জোর ধাক্কা দে-'
> এবারে সজোরে লাথি পড়লো, সেই সঙ্গে রাইফেলের কুঁদের দুটো বাড়ি, দরোজার পাল্লা জোড়া ভেঙে পড়ে আর কি।

> খুট করে আলো জ্বেলে দরোজা না খুলেই ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করে মনোয়ার, 'কারা আপনারা, কী চাই এতো রাতে?'
> 'পেলে দরবাজা খুলিয়ে, বাদমে মালুম হোয়গা কোন হায়।'
> মনোয়ার বেশ জেদের সঙ্গেই বলে, 'না, খুলবো না, কিছু জানার থাকলে দিনের বেলা আসবেন।'
> হঠাৎ দুড়ুম দুড়ুম করে দুটো ফাঁকা আওয়াজ তোলে ওদের দলের কেউ। গুলির শব্দে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কয়েকটা প্যাঁচা উড়ে যায়। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৫০-১৫১)

এছাড়াও আইন-কানুনের ভেঙ্গে পড়ার চিত্রও স্পষ্ট দেখা যায় :

> মিথ্যে বলার কি আছে!
> 'বহুত কিছুই আছে, কয়জন হাঁচা কয়, হাঁচা কইলে গাদ্দারি করবো কারায়, কামরা সার্চ করুম।'
> 'সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?'
> 'ওসব লাগে না, পুলিশগো লাগে।'
> সকলে মিলে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে এদিকে-সেদিকে, ছোট্ট কামরা, তেমন কিছু নেই হাতড়ানোর বা ঘাঁটাঘাঁটি করার মতো। গুলির শব্দ, ভারি ভারি জুতোর মচমচানি, কথা কাটাকাটি, একনাগাড়ে এতো কিছু চলতে থাকায় রাত মাথায় করে গোটা বাড়িটাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৫১)

যখন ন্যায় ও যৌক্তিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমষ্টির ডাক দরজায় এসে কড়া নাড়ে, তখন ব্যক্তি আর বিচ্ছিন্নসত্তা হয়ে থাকতে পারে না। সেই সময় ব্যক্তিসত্তা নিজের অজান্তেই সামষ্টিকসত্তায় উত্তীর্ণ হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যক্তিসত্তা সামষ্টিকসত্তায় একাত্ম হতে পেরেছিল বিধায় বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। 'কালো মাফলার' গল্পে মনোয়ার প্রথম দিকে ছিল ভয়-বিহ্বল আক্রান্ত আত্মকেন্দ্রিক সত্তা। কিন্তু পরবর্তীতে সেই মনোয়ারই পাকবাহিনী ও রাজাকারের সম্মুখে অকুতোভয়ে মুক্তিযোদ্ধা ভাই টুলটুলের উপস্থিতির তথ্য গোপন করে গেছে। এমনকি টুলটুলের দেয়া গ্রেনেড দু'টোকে রীতিমত লুকিয়ে ফেলতে পেরেছে। যে মনোয়ার অত্যাচারের ভয়ে কনফেস করতে চেয়েছিল, পরবর্তীতে সেই মনোয়ারই অত্যাচারীর বিপক্ষে নির্ভীক সত্তায় পরিণত হয়েছে। আর এটা সম্ভবপর হয়েছে দেশমাতৃকার ও সমষ্টির আহ্বানে। মনোয়ার শেষ পর্যন্ত সামষ্টিক চেতনাকে গ্রহণ করেছে :

> আমাকেও ফাঁসিয়ে গেল টুলটুল, মনে মনে হিজিবিজি কাটে মনোয়ার, দু'দুটো গ্রেনেড, ভালোয় ভালোয় আপদ বিদায় হলেই হয়, একটা ধাক্কা তো সবেমাত্র গেল। তবু যা হোক সামলানো গেছে, আশ্চর্য তো! আমি একটুও ভয় পাইনি, একটুও গলা কাঁপেনি, এতো সাহস এলো কোত্থেকে; ভয় পাওয়ার কথা, উল্লুকগুলোকে বোকা বানানো কি সহজ! (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৫৪)

মাহমুদুল হকের 'কালো মাফলার' গল্পের শত শত মাস্টারের প্রাণের ত্যাগে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ১৯৭১ সালের এই স্কুল মাস্টারের মত সাধারণের মৃত্যু থেকে উৎপন্ন হাল্লাহেনা টুলটুলের মত শত শত দেশমাতৃকার সন্তানদের বিপদ থেকে আড়াল করে রক্ষা করেছে। অর্থাৎ একাত্তরে শত শত স্কুল মাস্টারের প্রাণত্যাগ বৃথা যায়নি; তাইতো মৃত্যুও পরও প্রাকৃতিক উপাদান হয়েও দেশের মানুষকে রক্ষা করে চলেছে আজও। যখন সমষ্টিগত মুক্তির জন্য

সংগ্রাম করা হয়, তখন প্রকৃতিও সমষ্টির অনুকূলে কাজ করতে থাকে। 'কালো মাফলার' গল্পে মনোয়ারের চেতনাপ্রবাহরীতিতে স্কুল মাস্টারের হাস্নাহেনা গাছ হয়ে জন্মানো ও টুলটুলকে আড়াল করে রক্ষা করা মুক্তিযুদ্ধে সমষ্টির সাথে প্রকৃতির একাত্ম হবার প্রসঙ্গটিকে উত্থাপিত করে :

> আচ্ছা এমনও তো হতে পারে বেয়নেটের খোঁচায় মরা সেই স্কুল মাস্টারের দেহাবশেষ থেকে ওই হাস্নাহেনা গাছটার জন্ম, কতো কিছুই তো হয় পৃথিবীতে, ক'টা রহস্য আর মানুষ জানে, শেষ পর্যন্ত তার গা ছমছম করে ওঠে – গাছটাই আজ প্রাণরক্ষা করেছে টুলটুলের, রাশি রাশি পাতার ঝাঁপি দিয়ে কী গভীর মমতায়-ই না ঢেকে রেখেছিল, প্রতিটি পাতায় শিরশির করছিল ব্যাকুলতা, নিঃশব্দে চারপাশে জড়ো করছিল নিবিড় আঁধার, টুলটুল যেন মা'র কোঁচড়ে গিয়ে মুখ লুকিয়েছিল। [...] ভেতরে ভেতরে সে চলকে ওঠে, নিস্তব্ধ উঠোনের ঐ হাস্নাহেনা গাছটা যদি নিছক গাছ না হয়, যদি সেই মাস্টার হয়ে থাকে, তাহলে ঝিঁঝিঁ পোকাইবা মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দা বিমান হবে না কেন? আলো বাতাস-নদ-নদী-পাহাড়-পর্বত-গাছপালা-পোকামাকড় সবকিছুই যদি টুলটুল হয়ে এভাবে কাজ করে দেয়! (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৫৫)

১৯৭১ সালে আপামর বাঙালি চারিদিকে ধ্বংসস্তূপই প্রত্যক্ষ করেছে। কৃষক যেমন ফসল কেটে মাঠে ফেলে রাখে, ঠিক তেমনি পাকবাহিনী ও তার দোসররা বাঙালিদের হত্যা করে এদেশকে মৃত্যুস্তূপে পরিণত করেছিল। যত্রতত্র মানুষের লাশ এবং পাকবাহিনী ও রাজাকারদের দ্বারা মা-বোনদের সম্ভ্রম লুণ্ঠনের মত বিভীষিকার মধ্য দিয়ে একসময় বাংলা ভূখণ্ড মানবশূন্য হতে বসেছিল। মনে হয়েছিল সকলেই উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। মুক্তিযুদ্ধকালীন এই বিভীষিকার বর্ণনা পায় 'কালো মাফলার' গল্পে এভাবে :

> সকলের মুখে ঐ একই কথা বিভীষিকা, একি বিভীষিকা! ও কি? ধোঁয়া! ধোঁয়া কি উগ্রতেজা! যাও হে জটাজাল, হাঙ্গা করোগে বিভীষিকারে, সাতহাত নোলায় ঠোনা মারোগে! ফিঙেরাজা এবার মঠবাড়ির চূড়া খোঁজে, কোথায় মঠবাড়ি, লোহার ত্রিশূল মাটিতে গড়াগড়ি খায়, ধুলোয় বুট জুতোর হার্মাদ গন্ধ, পচা গন্ধ উরেশালা! ওড়ার আর শেষ নেই ফিঙেরাজার; প্রথমে ধানের গোলা, তারপর মাড়াই কল, তারপর গরুর গোয়াল, বাঁশের সাঁকো। গোলায় গোলায় বুলেটধান, মাড়াই কলে আমনমানুষ, আউশমানুষ, গোয়ালে গোয়ালে জাবরকাটা বেঢপ রাজাকার – তোর বইনেরে দিবি, মঞ্জুরে দিবি, রাজাকার নিকা করবার চায়। [...] যুবতী নেই তো কি তোর বাপের মাথা আছে? ফিঙেরাজার কানে বাজে রসিকতা, পুঞ্জীভূত জোনাকিপোকারা মরে যায়, মানুষ নেই কেন, মানুষ? এই শব্দ গুমগুম করে বাজে, চর্তুদিকে। মানুষ নেই মানুষ নেই – চতুর্দিকে এই শব্দ মানুষ নেই মানুষ নেই, চতুর্দিকে। নৌকাগুলো যেমন নদীর একবারে তলায়, চোখগুলো যেমন নৌকোর মতোই ভিজে ছলছলে, মানুষজন যেমন ওপড়ানো চোখের মতো ছড়ানো-ছিটানো, তেমনি সবকিছু, 'সবকিছু এলোমেলো, ছত্রখান, ছারখার। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৫৬)

মুক্তিযুদ্ধে বাংলার বীর সন্তানদের কাছে গর্ভধারিণী মায়ের স্নেহ, ভালোবাসার চাইতে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার টান শক্তিশালী ছিল। ফলে দেশ ও দেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্য টুলটুলের মত হাজার হাজার বাংলা মায়ের সন্তানেরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ভয় পায়নি। কিন্তু সেই বীর

সন্তানেরা যে সকল মানুষের মুক্তির জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে, তাদের হাতেই চোরের অপবাদ নিয়ে গণপিটুনিতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এভাবেই অনেক সময়ই মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে নিজ দেশে নিজ জাতির দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে। পাড়ায় একটি ছেলের মৃত্যুর বিষয়ে মনোয়ার ও মনোয়ারের পিতার কথোপকথনে সেই বিষয়টি পরিস্ফুটিত :

> মনোয়ার জিজ্ঞেস করবে, 'মরে পড়ে আছে মানে, কারা মারলো?
> পাড়ার লোকজন নিজেরাই ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলছে। গলির মুখে রেশনশপের পাশের ড্রেনে পড়ে আছে এখনো। রাতে পাঁচিল ডিঙোবার সময় ধরা পড়েছিল, বলাবলি করছে অনেকে। চুরি করার মতলব না থাকলে পাঁচিল ডিঙোতে যাবেই-বা-কেন! কেউ কেউ বলছে আবার পিটিয়ে নয়, গলায় ফাঁস দিয়ে মারা হয়েছে হতভাগাটাকে, এখনো নাকি গলায় একটা মাফলারের ফাঁস আটা, মানুষ আর মানুষ নেই! (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৫৭)

তিন.

মাহমুদুল হকের *প্রতিদিন একটি রুমাল* গল্পগ্রন্থের সংযোজন অংশের অপর একটি গল্প 'গরু-ছাগলের গল্প'। 'কালো মাফলার' গল্পটির মত এখানেও একটি বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে; সেটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকালীন এদেশের মানুষের মনোজগতে ভয় ও আতঙ্কের আধিপত্য। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই ভয় ও আতঙ্ক বাঙালির সবচেয়ে বড় অনুষঙ্গ যা 'গরু-ছাগলের গল্প'তে দেখা যায়। তবে, গল্পকার মাহমুদুল হক মূলত সনাতন ধর্মালম্বীরা সেই সময় কীভাবে পাকবাহিনী ও তার চাটুকার রাজাকারদের অত্যাচার ও নির্যাতনের আতঙ্কে সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত থেকেছে তার চিত্রগুলো তুলে ধরেছেন। একাত্তরে এদেশে একটা স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি ছিল যারা দেশের স্বাধীনতা চাইত না। এরা রাজাকারদের কখনো কখনো নিজেদের স্বার্থের জন্য নিরীহ বাঙালির ওপর লেলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু রাজাকারদের এই লাগামহীনতার উপর তাঁদেরও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। 'গরু-ছাগলের গল্প'টিতে দেখি মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকাররা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করবে না এই মর্মে টাকা নেয়; কিন্তু তারা সেই ওয়াদা রক্ষা করে না। তাই তো আয়নল মাস্টারকে রাজাকাররা আরো বেশি টাকা দাবি করে ফিরিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধকালে রাজাকারদের শোষণ ও লুণ্ঠনের লাগামহীনতার বর্ণনা আয়নল মাস্টারের ভাষ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে এভাবে :

> একটু জিরিয়ে নিয়ে আয়নল মাস্টার আবার বললে, মানুষের মতিগতি জিনিসটাই এমন ধারার। তা খুব কম দেখা হলো না জীবনে; হয়তো কেউ নিছক নিজের স্বার্থ উদ্ধারের মতলবে বদমাশগুলোকে তলে তলে উস্কে দিচ্ছে, কাঁধের ভূত যে নামাবে, হয়তো ওদের নিজেদের সে সাধ্যি নেই কিংবা আরো বড় লোভ দেখিয়েছে, ওরা সেই টোপ গিলেছে। [...] আজ ধরেছে আবার উল্টো সুর, তোমরা হাজার টাকা দিয়েছ, না তার বেশি, এই নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ। সে কত রকমের জেরা, জেরার ঠেলায় অন্ধকার। বললে টাকাটা তো আপনার হাতে তুলে দিয়েছে রঘুপাল, আপনি কী করে জানলেন ভালো মানুষের মতো সবটাই আপনাকে দিয়েছে! এ তো আর তার বাপের ঘরের টাকা নয়, দশহাতের চাঁদা, কিছু হজম না করে এমনি দেয়ার পাত্র সে নয়। রঘুকে আমরা খুব ভালো চিনি, আপনি বলতে চান ভেতরে ভেতরে ভোটাভুটির সময় গাঁটগচ্চা যায়নি তার? ইচ্ছা করলেই আমরা প্রমাণ করতে পারি, ও ইন্ডিয়ায় টাকা পাচার করে। আমি বুঝিয়ে বললাম, তোমরা তো হাজার টাকাই দাবি করেছিলে বাপু, এখন আবার

> প্যাঁচ কসা কেন। রাতারাতি সুর বদলে ফেলেছে আলী আহম্মদ। বললে তখন এক হাজার টাকা দাবি করা হয়েছিল হিসাব-পত্তর না করেই। এখন আমাদের হাতে আছে বাওইসারের গোয়াল ব্যাটাদের মালামালের জ্যান্ত ফর্দ। কাজলী আর বকুন মিলে পনেরো গণ্ডা মতো গাইগরু, মন বিশেক পিতল-কাঁসা, দুইশ' ভরি সোনা, গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়েমানুষ। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৫৯-১৬০)

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর পাশাপাশি বাঙালিদের মধ্য থেকে রাজাকার নামক এক শ্রেণির নরপিশাচ নিজের জাতিকে ভুলে নিজের জাতির উপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছিল। লুণ্ঠন, শোষণ, মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য পাকবাহিনীর নিকট প্রকাশ করে দেওয়া, মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করে নিজেদের লালসাকে চরিতার্থ করেছে। রাজাকাররা এতটাই বিবেকবর্জিত ছিল যে, নিজে বাঙালি হয়ে আরেক বাঙালির উপর অত্যাচার করতেও পিছ-পা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে এই রাজাকাররা বারবার তাদের তীক্ষ্ণ নখ-দন্তের দ্বারা বাঙালি জাতিকে রক্তাক্ত করেছে। স্বভাবতই এই গল্পে তপা ঘোষের মনে প্রশ্ন জেগেছে :

> তপা ঘোষ বললে, জুলুম নয় তো কী? তা নইলে আমাদের ওপরে হামলার কথা ওঠে কেন, অ আমরা কেউ নই নাকি? ওরা বিহারি হলে একটা কথা ছিল, এক বাঙালি ভাই আরেক বাঙালি ভাইয়ের ওপর অকারণে জুলুম চালাবে এর মানেটা কী? তাহলে দেশের স্বাধীনতার জন্য এতোসব ঝক্কি পোহানোর দরকারটা কী? দেশের লোক রক্ত দিচ্ছে না? কাদের জন্য দিচ্ছে, কিসের জন্য দিচ্ছে? (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৬১)

মূলত পাকবাহিনী তার সহযোগী হিসেবে বাঙালিদের মধ্য থেকে গুণ্ডা-পাণ্ডাদের রাজাকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পাকবাহিনী তাদের কায়েমি স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য এসব গুণ্ডা-পাণ্ডাদের নিরীহ বাঙালির জানমাল ও ইজ্জতের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিল। এই গল্পে দেখতে পাই, এসব রাজাকারদের প্রত্যেকে হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন অপরাধের দাগী আসামী। ফলে, পাকবাহিনীর মদদে মুক্তিযুদ্ধের সময় এরা আরো বেশি ক্ষমতাশালী ও হিংস্র হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধকালে রাজাকাররা কতটা হিংস্র-দাঁতাল আর সুবিধাভোগী ছিল তার বাস্তব চিত্র আমরা আলোচ্যমান গল্পে পাই :

> পাহাড়ি দেশের লোকজন বোঝেন না, দুটো পয়সাপাতি আর আমোদ-ফূর্তির জন্যই তো এ চাকরি নিয়েছে শালারা। বিশাইগাতি নলিতা কি নকলা থানায় এক একজনের নামে দশ-বিশটা করে মার্ডার কেস ঝোলানো ছিল এতোদিন, এখন হাত-মুখ ধুয়ে সব দেশের কাজে লেগেছে। কালিয়ানগর, স্টিমাজোহোরা, কবুতরমারি, এসব গ্রামের বিখ্যাত রোস্তম এরা, তেমন বুকের পাটা কার আছে ওদের ঠেকাবে। [...] এক হাজার টাকা নাকি হাতের ময়লা, ময়মনসিংহের রাজাকাররা বলছে সব জানা আছে আমাদের দেশের দুশমন আর একটাও রাখবো না, বেছে বেছে মারবো, ধুলোয় লুটিয়ে দেব সবকিছু, এক হাজার টাকা খুইয়ে ওদের নাকি অপমান করা হয়েছে, দাঁও মারা আর কি, ওরা এখন চাচ্ছে কোপ বসাতে, লুটেপুটে নিতে, খেয়ে খেয়ে নোরা দশ হাত বাড়লে যা হয়। বেতকা আবদুল্লাপুরের রাজাকাররা হিন্দুদের কাঠের গোলায় আগুন লাগিয়ে দিব্যি বিখ্যাত হয়ে গেছে রাতারাতি। বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে এখন দমাদম যাকে পছন্দ তাকে ঘরে তুলছে, যেচে সালাম দিচ্ছে মানুষজন, এক এক রাজাকারের বৌয়ের হাতে দু-চারটা করে ঘড়ি। তারা এখন ঘড়ি পরে খুন্তি নাড়ে, ঘড়ি পরে খালে নামে, ওয়াটারপ্রুফ ঘড়ি। হাতে হাতে সব ট্রানজিস্টার, পেশাব-পায়খানার জন্য বাঁশবনে ঢুকলেও হাতে ঝুলিয়ে

> রাখে। রাহেলিল্লা কাণ্ড এসব, এদের তো মাথা বিগড়ানোরই কথা। এতোদিন যে ঠিক ছিল সেটাই তাজ্জবের, ঘাই তো মারবেই। এ হচ্ছে গিয়ে হাতির পিঠে চেপে ভিক্ষে করা। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৬৩)

অর্থাৎ রাজাকাররা মুক্তিযুদ্ধের সময় কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল মাহমুদুল হক তাঁর নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন 'গরু-ছাগলের গল্প'টিতে।

যুদ্ধ সবসময়ই ধ্বংসাত্মক। যুদ্ধে সাধারণ মানুষ খুবই অসহায় হয়ে পড়ে। সর্বদা আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করে। আলোচ্যমান গল্পটিতে দেখা যায় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সর্বদা পাকবাহিনী ও রাজাকারদের আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। অনেক সময় যুদ্ধাবস্থায় শোষিত মানুষের মধ্যে সংগ্রামী সত্তা জাগ্রত হয়; কিন্তু মানুষ তাঁর সেই সংগ্রামী সত্তাকে বাইরে বের করে আনতে পারে না। ভয় তাদের বিপ্লবী সত্তাকে চারপাশ থেকে গ্রাস করে। তপা ঘোষের কথায় সেই ন্যায় ও সংগ্রামের বাণী উচ্চারিত হলেও গ্রামীণ পটভূমির এই সাধারণ মানুষগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় কতটা অসহায় ছিল তার প্রমাণ খুঁজে পায় এই গল্পে :

> তপা যা তুলেছে, তা উপস্থিত সকলেরই মনের কথা। ভেতরে ভেতরে সবাই ক্ষুব্ধ কিন্তু ঐ পর্যন্তই, কারো তো কিছু করার নেই, সবদিক থেকে হাত-পা-বাঁধা, নিজের গ্রামে নিজের বাড়িতে এ রকম চোরের মতো বাস করার মতো ঘৃণ্য আর কী আছে। তপা উঠে যাওয়ায় ঘরের আবহাওয়া আরো গুমোট হয়ে ওঠে। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৬১)

সম্ভ্রম মানুষের অতি মূল্যবান সম্পদ। বাঙালি সমাজে বিশেষ করে নারীরা নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য মৃত্যুকে হাসি মুখে বরণ করে নিতে ভয় করে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী ও রাজাকাররা গোলাবর্ষণের পাশাপাশি বাংলার নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট করার পণ করে হামলে পড়েছিল। একাত্তরে বিশেষ করে রাজাকাররা নিরীহ বাঙালিদের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করা, লুণ্ঠন, টাকা না পেলে ঘর-বাড়িতে আগুন দেওয়া কিংবা ঘরের মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়ার মত হীন কার্যে লিপ্ত ছিল। ফলে, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিদের অগ্নি ও ইজ্জত এই দু'টি বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে হত। এই গল্পে বিশু ঘোষের উক্তিতে সেই বিষয়টি ফুটে উঠেছে :

> 'কপালের ফের তো এ্যারেই কয়' বিশু ঘোষ সমর্থন করে বললে, 'মান-ইজ্জতের লাইগা ভিক্ষা কইরা হইলেও আমাগোরে দেওন লাগবো।' 'তোমরা রইছো বেহুদা ইজ্জত-বেইজ্জত লয়া। যোগেন ঘোষ মধ্যে থেকে বললে, 'খারাবিটার কথা ভাবতাছো না ক্যান! নারায়ণগঞ্জে আজকাও আগুন জ্বলতাছে, তালতলা থিকা মানুষজন দেইখা আইছে, কমলাঘাটে মিলেটারিরা ঘাঁটি বহাইতাছে। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৬২)

আসলে মুক্তিযুদ্ধকালে রাজাকাররা রক্তচোষকের জায়গায় নিজেদের দাঁড় করিয়েছিল। শতভাবে নিরীহ মানুষের সর্বস্ব লুটে নিয়েছে কুলাঙ্গাররা।

> আয়নল মাস্টার বললে, টাকা জোগানোর চিন্তা বাদ দিতে হবে, ও দিয়ে শেষ পর্যন্ত ওদের রোখা যাবে না। আর খাঁইও তো নেহাত কম না, রক্তে চুষে নেয়া এই হচ্ছে মতলব। সেদিন চা-নাশতার নাম করে নিলো পঞ্চাশটা টাকা। এক হপ্তা যেতে না যেতেই আবার বায়না, বুঝে দ্যাখেন কী বিশ্রী আমাদের কাজটা, সবই তো দেশের জন্য, একটু-আধটু আমোদ-ফুর্তি না

> পেলে মরে ভূত হয়ে যাবো, আমাদের ফিষ্টির জন্য একটা ছাগল চাই, আপনি একটু বলে দিলেই হয়ে যায় নানা। কতো হাত কচলানি। তা সিধু ঘোষ নিজ থেকেই বললে, আমি দেবো, আপদে-বিপদে অমন এক-আধটু মন জুগিয়ে চলতে হয় দুষ্ট লোকজনের। খুব হল্লা পাকিয়ে তো ফিষ্টি করলে, তারপর আবার হাত চুলকানি, বাইরে থেকে আসা রাজাকাররা নাকি মানতে চায় না, আলী আহম্মদ বললে আমি শুধু আপনার মুখপানে চেয়ে ওদের কোনো রকমে ঠেকিয়ে রেখেছি, আর বুঝি পারলাম না, আমি তো নামে কমান্ডার, বলতে পারেন ওরাই সব। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৬২-১৬৩)

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় বাঙালি একবার ভিটে-মাটি ছেড়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়–ইতিহাস তার সাক্ষী। ১৯৭১ সালে বাঙালিকে আরেকবারের জন্য শেকড়চ্যুত হতে হয়। পাকবাহিনী আর রাজাকারদের অত্যাচারে জানমাল ও ইজ্জত বাঁচাতে সবকিছু ফেলে রেখে শরণার্থী হতে হয়। কিন্তু যে বাঙালি শত দুর্যোগেও বাপ-দাদার ভিটে ত্যাগ করেনি, একাত্তরে সে সেই ঘটনার সম্মুখীন হয়। শেকড়চ্যুতির হাহাকার এই গল্পের বুড়ো হাজরা ও রঘু পাল চরিত্রদ্বয়ের কথোপকথনে ফুঁটে উঠেছে :

> 'রঘু পাল বললে, 'ঘবরবাড়ি, জমি-জিরেত সব ফেলে মানুষজন যাচ্ছে না?'
> 'তা তো যাইতাছেই কিন্তু আমরা কি পারুম, আমার তো মাথায় আহে না।'
> 'উপায় না থাকলে করবেনটা কী? '
> 'বাপ-কাকার ভিটিমাটি, কতো ঝড়জলই না গ্যাছে, মাটি কামরাইয়া পইরা থাকছি, এই বুড়াকালে সব ফালাইয়া কই যামু,
> ক্যামনে যামু, আমার মাতায় কিছু আহে না, পালমশয়, কিছুই বুঝতাছি না।'
> 'এতো বড় ঝুঁকি নিয়ে গাঁয়ে থাকার কোনো মানে হয় না, গ্রাম ছেড়ে ধারেকাছে কোথাও উঠতে হবে আমাদের আপাতত।' (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৬৪)

অর্থাৎ ১৯৭১ সালে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম সকলে অস্তিত্বসংকটে ভুগেছে।

যুদ্ধ অত্যাচারী শাসক ও সৈন্যদের নিকট এক ধরনের নেশা। যুদ্ধের সময় মানুষ হত্যার নেশা শাসকদের এতটাই পেয়ে বসে যে, তারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এই সময় মানুষের রক্ত নিয়ে অত্যাচারীরা এতটাই হোলি খেলাই মত্ত হয়ে পড়ে যে, তাদের মধ্য থেকে সকল ধরনের মূল্যবোধ বিসর্জিত হয়। শাসকের ভেতর শুভবোধ বলে আর কিছু থাকে না। তেমনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় মূল্যবোধ বিবর্জিত পাকবাহিনী ও রাজাকারদের উন্মাদ-উন্মত্ত চেহারাটি সম্পর্কে জানতে পারি :

> 'বুড়ো হাজরা বললে, যাইতে আপত্তি নাই, কিন্তু ফিরা পামুডা কী? ভিটিমাটির কিছু কি থাকবো।'
> 'অহনেই আপনের ফিরনের চিন্তায় খাউজাইতাছে?' রঘু পাল বললে, 'লুটপাটের নেশায় ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে, যেভাবেই হোক সুযোগ ওরা করে নেবেই, মাস্টার সাব আপনি কী বলেন?'
> 'ঠিক?'
> 'কমলাঘাট পর্যন্ত যদি আর্মির ছাউনি পড়ে, তাহলে আর কোন ভরসায় এখানে পড়ে থাকা। আলী আহম্মদের লেজ তো গজাবেই।' (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৬৪)

গরু-ছাগলের গল্প'টিতে আমরা দেখি, মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশেষ করে রাজাকাররা হিন্দুদের টার্গেট করে। তারা ধর্মের নামে হিন্দুদের পাড়াগুলোতে অত্যাচার, নির্যাতন চালায়। অথচ বাংলাদেশের হিন্দুরাও বাঙালি। রাজাকাররা হিন্দুদের শত্রু জ্ঞান করায় হিন্দু পাড়াটি সর্বদা আতঙ্কের মধ্যে থাকে। কেননা যে কোন সময় তাঁদের পাড়ায় হামলা হতে পারে। কিন্তু বড় বিষয় হচ্ছে রাজাকারদের হামলা সামলানোর মত সামর্থ্য তাঁদের নেই। ফলে, জানমাল ও ইজ্জত বাঁচানোর জন্য উৎকোচ প্রদান করে। কিন্তু তারপরও রাজাকাররা ক্ষান্ত হয় না; বরং তারা আরো বেশি অর্থ দাবি করে বসে। আসলে মুক্তিযুদ্ধকালে রাজাকারদের রক্তে উন্মত্ততা ভর করেছিল। যার ফলে, তারা হাটে ও শুধু হিন্দুদের দোকানগুলোতে আগুন দিয়েছে। আসলে ধর্মের নামে তাদের অত্যাচারী সত্তাকে চরিতার্থ করাটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল এই সকল হামলার। 'গরু-ছাগলের গল্প'টিতে দেখা যায় :

> দম নিয়ে সুখেন বললে, 'রাজাকাররা হাটে আগুন দিছে।'
> হাটবার গেছে গতকাল। এমন দ্রুত সব ঘটবে, কেউ তা আঁচ করেনি। এক মুহূর্তে সকলের মন থেকে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই কারো মনে, হামলা একটা আসবেই, যেমনই হোক তার দাঁতনখের চেহারা, ওদের ঠেকানো যাবে না, বিপদ এখন দোরগোড়ায়।
> আয়নল মাস্টারে জিজ্ঞেস করে, 'বুঝলে কী করে রাজাকাররাই আগুন দিয়েছে?
> সুখেন বললে, 'ঘাটে একখান নওপাড়ার নাও ভিড়ছিল, মাঝি কইলো হে নিজ চক্ষুতে দেইখা আইছে রাজাকারগো, হেরা বাইছা বাইছা হিন্দু দোকানগুলোতে আগুন দেওয়াইতাছে।' (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৬৫)

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি এতটাই উদ্ধত ছিল যে, তারা পূর্বে হামলার কথা জানিয়ে দিয়ে সেই দিনক্ষণ অনুযায়ী হামলা করত। তারা এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি করে রাখত মানুষের মনে। মুক্তিযুদ্ধের আরেকটি দিক এই গল্পে খুব স্পষ্ট যে, যুদ্ধকালে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠতরাজ সর্বত্র বিরাজ করছিল। আর এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে সুযোগ গ্রহণ করে একটা শ্রেণি নিজের জায়গা পোক্ত করে নিয়েছে। এই গল্পে রাজাকারদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার যে চিত্রটি পায় তা হচ্ছে :

> 'কইলো আমাদের গ্রামের দিকে আইবো হেরা' হঠাৎ সুখেন বললে, 'ওগো কাছে নিকি কইছে, ঘোষেগো কয়া দিচ, আমরা আইতাছি! '
> বুড়ো হাজরা বললে, 'কাগো কাছে কইছে? '
> 'মাঝির কাছে কইছে? '
> এক হাঁকড়ানি মারলো হাজরা। বললে, 'খুইলা কইতে তর কি অয় শালারজান।'
> 'নওপাড়ার হাবিব মাঝির কাছে কইছে।'
> রঘু পাল বললে, 'এটা একটা তামাশা, আমাদের ভয় দেখাতে চায়।'
> আয়নল মাস্টার সায় দিয়ে বললে, 'আমার ধারণাও তাই, একটু খেলাচ্ছে। '
> বিশু ঘোষের কাছে ব্যাপারটা এতো সহজ সহজ মনে হয় না, গ্রামজুড়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটতরাজ শুরু হয়ে গেছে, তার হাবভাবে সেই রকমের আতঙ্ক।' (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৬৬)

যুদ্ধকালে নারীর ইজ্জত বাঁচানো নিয়ে অনেক আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী ও রাজাকাররা বাঙালি নারীদের 'মালে গণিমত' ভাবত। ফলে তারা মা-বোনের ইজ্জতের ওপর সব চাইতে বেশি আঘাত করেছে। জীবনে কখনো কখনো এই ইজ্জত, সম্ভ্রম আমাদের দুর্বল করে দেয়। যুদ্ধের সময় ইজ্জত বাঁচানোর জন্য সর্বদা মনের মধ্যে এক ধরনের ভয় ও আতঙ্ক কাজ করে; আর এই ভয় ও আতঙ্ক, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেয়। এই গল্পে এই বিষয়টি লক্ষণীয় :

> কেউ একজন মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো। 'ক্যান, বোন্দা বোন্দা বুইরাগুলিন যহন মাগীগো রহম কান্দে, তখন কিছু ক'বার পারো না হেগো? ত্যাজ বেবাক মাগীগো কাছে।' এ গলা যে তার পুত্রবধূর, বড় হাজরা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সে বললে, 'তগো লয়াই তো ব্যাক ঝামেলাডি। তরা না থাকতি, তো দেহা যাইতো কারে কয় ফয়সালা। সবতে মিলা ঝাঁপায়া পড়তাম ওগো ঘাড়ে, ক্যান, মনে নাই তগো, ডাকাত খেদাই নাই, ডাকাইত গো কাল্লা ফালা ফালা করি নাই? (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৬৬-১৬৭)

'গরু-ছাগলের গল্প'তে তপা ঘোষ গ্রামের ছেলে কিন্তু শহর ঢাকার জগন্নাথ কলেজে আইকম পড়াশুনা করে। তপা ঘোষের মূল্যায়নে, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী প্রথম আঘাত হেনেছিল শহরের প্রধান প্রধান জায়গাগুলোতে। কিন্তু শহরের তুলনায় গ্রামে পৌছাতে পাকবাহিনীর কিছুটা সময় লেগেছিল। এই জন্য যুদ্ধের প্রথম দিকে শহরবাসী প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভয় ও আতঙ্ক নিয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে থাকে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহরবাসীদের গ্রামে গিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। কারণ পাকবাহিনীর ভয়াল থাবা বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। হয়তো যে গ্রামে পাকবাহিনী পৌঁছাতে পারেনি, সেখানে পাকবাহিনীর দোসর রাজাকাররা তাণ্ডবলীলা বজায় রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে গ্রাম ও শহর দুই জায়গা প্রত্যক্ষকারী তপা ঘোষের ভাষ্য মতে :

> এ ছাড়াও আছে বাইরের বন্ধু-বান্ধব, জানাশোনারা। এখন কোনো কিছুই আর হিসেব মেলে না। এতদিন সবচেয়ে নিরাপদ ছিল গ্রাম। শহর ঝেঁটিয়ে গ্রামে গ্রামে ঝাঁক বেঁধেছিল আতঙ্কগ্রস্ত মানুষজন। এখন বিপদ দেখা দিয়েছে সেই গ্রামের একেবারে ভেতর থেকে। হোক না রাজাকার, তারা তো বাঙালিই, দেশের মানুষ; তপা ভেবে পায় না এরা কেন এমনভাবে নিপীড়নের খেলায় মেতে উঠেছে সরাসরি। বাঙালি নিয়ে কথা, জাত আর ধর্মের কচকচি শিকেয় উঠেছিল, এ পাওয়াটা না চাইতেই, আর তপার চৌহদ্দিও অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল এর ফলে। রাজাকারগুলো বাঙালি, তপা জানে। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৬৭-১৬৮)

অর্থাৎ একদিকে পাকবাহিনী অন্যদিকে রাজাকার এই দুইয়ের নিষ্পেষণে বাঙালি জাতি চরম আকারে রক্তাক্ত হয়। যখন কোনো রাষ্ট্রে যুদ্ধ সংঘঠিত হয় তখন ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীবনের পাশাপাশি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের জায়গাগুলোও ভেঙে পড়ে। যুদ্ধের যাঁতাকলে যেখানে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন সেখানে সম্পর্কগুলো কিংবা পারস্পরিক স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। 'গরু-ছাগলের গল্প'তে তপা ঘোষ ও নুনির স্বপ্নগুলোকেও ভেঙ্গে পড়তে দেখি। ভয় আর আতঙ্ক তাঁদের জীবনের সবকিছুতে অস্তিমের মধ্যে পতিত করেছে। ফলে, তপা ও নুনি হামলার রাতকে জীবনের শেষ রাত ভাবতে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধের করাল গ্রাসে তপা ঘোষ ও নুনির স্বপ্ন ভঙ্গের বিষয়টি এই গল্পে স্পষ্ট :

> এই হচ্ছে জীবনের শেষ রাত, এই দৃশ্যই হচ্ছে শেষ দৃশ্য, এরপর সে কিংবা নুনি কেউই থাকবে না, থাকলেও তা অন্যভাবে, তখন কেউ আর কাউকে চিনবে না। এমন কষ্ট, তপার মনে হতে থাকে এতোদিন সে কেবল নুনির জন্যই বেঁচে ছিল। কিংবা এতোদিন সে মরেই ছিল, নতুন করে আবার বেঁচে উঠেছে, শুধু একবার প্রাণভরে নুনিকে দেখতে চায়। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৬৮)

মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষের ঘর-বাড়িতে আগুন দেয়া, নির্বিচারে মানুষ হত্যা, সম্ভ্রমহানি সর্বত্র চোখে পড়ে। কিন্তু নুনির মত সরল গ্রামীণ নারী ভাবতে পারেনি তাদের সাথে এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে। তাই তো নুনির উদ্দেশ্যে যুদ্ধের বীভৎসতা নিয়ে তপার উচ্চারিত উক্তিকে নুনি নিছক ডর দেখানো বলে ভেবেছে। তপার উক্তিতে মুক্তিযুদ্ধের বীভৎসতা সম্পর্কে আগাম আভাস পায় :

> 'জানস না কী অইবো? জানস কিছু?' হাপ ধরে যায় তপার, সে প্রায় নিঃশেষিত। বললে, 'ছাড়ব নিকি তগো? ঘরে আগুন দিব, আমাগো পিটাইয়া জলে ভাসায়া দিব, আর তগো খাইবো, কী বুঝলি, হাউস মিটায়া আচ্ছা মথন খাইবো তগো-'
>
> নুনি হাউমাউ করে ওঠে– 'ক্যান তুমি আমারে ডর দেহাইতাছ, পাইছ কী?'
>
> 'হঁ, আমি তোরে ডর দেহাইতাছি। হেরা আয়া লউক। দেহিচ। অরা আয়া লউক। তগো ক্যামনে ফালা ফালা কইরা ফালায় দেহিচ।' (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৭০)

সাধারণ সময়ে আমাদের সমাজে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে জাত-পাত, শুচি-অশুচির বিষয়গুলো বড় আকারে মানা হয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মত বৃহৎ বিশৃঙ্খল সময়ে মানুষের মধ্য থেকে সকল ভেদাভেদ দূর হয়ে যায়। যুদ্ধের ভয় আর আতঙ্ক মানুষকে এক জায়গায় কুঁকড়ে ধরে। তেমনি এই গল্পে দেখি, তপা আর নুনি এক সাথে মরতে চেয়েছে। সেখানে শুচি-অশুচির ভেদ একদম তুচ্ছ হয়ে পড়েছে। এই গল্পে তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় :

> নুনিও কাঁদে। খুব ভালো লাগে তার কাঁদতে। এরই মধ্যে জীবন যেন ছত্রাখান হয়ে গেছে, অথচ আশ্চর্যের কথা তাতে নিজেদের কোনো হাত নেই; যেমন যোগেন কাকার এই পানের বরজ, সে তো জানেই কাইল্যার মড়কে এটা সাফ হয়ে যাবে, তার গায়ে ঘুসঘুসে জ্বর, এখনো সে অশুচি, এখন আর মানামুনি কি। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৭২)

গরু-ছাগলের গল্প'টিতে সর্বশেষে যে আর্তনাদ শুনতে পায়, সেটা যুদ্ধকালীন চিরায়ত বাস্তবতাকে প্রকাশ করে। যুদ্ধের সময় মানুষ থেকে শুরু করে পশু-পাখির আর্তনাদে চারিদিকে কান্নার যে রোল পড়ে, সেটি এই গল্পে চোখে পড়ে। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলার আকাশে-বাতাশে এই রকম আর্তনাদ প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হত।

> এক এক করে সবগুলো কুকুর জড়ো হয় উঠোনে। মেয়েদের কান্না শুনতে পায় তপা। বিকট চিৎকার করে চলেছে কুকুরগুলো। একটা মড়মড়ে শব্দ কানে আসে। ঝোপঝাড় ভেঙে কিছু একটা ছুটে আসছে, তপার গায়ে কাঁটা দেয়। সে আকাশ-বাতাস কাঁপানো বাঁ বাঁ চিৎকার শুনতে পায়। বন-বাদাড় ভেঙে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় একটি গরু, গায়ে ছালের নামগন্ধ নাই, রক্তাপ্লুত। বাঁ বাঁ করে বিকট নিনাদ তুলে তারপর একসময় গোয়ালঘরের মুখে দড়াম করে, পড়ে যায় ভয়াল দর্শন গরুটি। বরজের গায়ে চোখ লাগিয়ে সবকিছু পরিষ্কার

> দেখতে পায় তপা। সে আকাশের দিকে তাকায় এই সময় চাঁদকে তার উচ্ছৃঙ্খল রাজাকার মনে হয়; জোছনা তো নয়, যেন বিদ্রূপের হাসি, তাচ্ছিল্যের হাসি, বিকট রসিকতা। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৭২)

অর্থাৎ উপরিউক্ত গল্পটির নামকরণের মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থে গল্পকার মুক্তিযুদ্ধকালীন গরু-ছাগলের আর্তনাদের দ্বারা মূলত বাঙালি জনগণের আর্তনাদকে বুঝিয়েছে।

চার.

মাহমুদুল হকের *প্রতিদিন একটি রুমাল* গল্পগ্রন্থের সংযোজন অংশের তৃতীয় ও শেষ 'বেওয়ারিশ লাশ' নামক গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন বাস্তবতার এক ঝলক বয়ান। এই গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালে দেশমাতৃকার বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবিত অথবা মৃত অবস্থার কঠিন বাস্তবতার চিত্র গল্পকার অঙ্কন করেছেন। গল্পটিতে আমরা মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের মহিমা যেমন দেখতে পায়, তেমনি চরম অবহেলার চিত্রও খুঁজে পায়। 'বেওয়ারিশ লাশ' গল্পে একটি পরিচয়হীন লাশের সম্পর্কে তরফদার ও জামশেদ চৌধুরীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের চরম দুর্দশার কথা জানতে পারি। মুক্তিযুদ্ধে এমন অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে যে মুক্তিযোদ্ধার লাশ শনাক্ত পর্যন্ত করতে কেউ যায়নি। এমনকি কোনো কোনো সময় পরিবার পর্যন্তও ভয়ে স্বীকার করেনি এটা তাঁর সন্তানের লাশ। অথচ পরিবার, দেশ ও দেশের মানুষের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই কঠিন বাস্তবতা ফুটে উঠেছে তরফদার ও জামশেদ চৌধুরীর সংলাপে :

> 'তরফদার বসে এক গ্লাস পানি খেলেন। বললেন, 'লাশ যে কার কিছু বোঝা গেল না। ছোকরা বয়সের গেরিলা-টেরিলা একটা হবে, তোমার কী মনে হয়?'
> জামশেদ চৌধুরী বললেন, 'এ পাড়ার কোনে ছেলে নিশ্চয়ই?'
> 'তা-ইবা কী করে বলি! কেউ তো চিনতে পেরেছে বলে শুনিনি। রহস্যটা তো এখানেই। কোথাকার কে মরে পড়ে রয়েছে এইখানে।'
> 'আমার মনে হয় এ পাড়ারই কোনো ছেলে, রাত্রে আর্মিরা মেরে গেছে। যাদের ছেলে তারা জেনেশুনে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে, ভয়ে ধরা দিচ্ছে না।'
> তরফদার বললেন, 'তা হয় না। চোখে দেখে কেউ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তোমার হলে পারতে?'
> 'অবস্থাগতিকে অনেক কিছুই হয়।' (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৭৪)

গল্পকার মাহমুদুল হক মুক্তিযুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি তথা রাজাকার শ্রেণিকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করতে পেরেছেন। পূর্ববর্তী দু'টি গল্পের মতো 'বেওয়ারিশ লাশ' গল্পেও রাজাকারদের উপস্থিতি লক্ষ করি। রাজাকারদের প্রতি তরফদারের ঘৃণা থেকে বুঝা যায়, এই রাজাকার কারা ছিল এবং তাদের কর্মকাণ্ড কতটা জঘন্য ছিল। জামশেদ চৌধুরী ঘরের পাশে পড়ে থাকা লাশটি সরিয়ে নেয়ার জন্য স্থানীয় রাজাকার ক্যাম্পে যোগাযোগ করার প্রসঙ্গ তুললে তরফদার বলেন :

> 'এক কাজ করলে কি হয়? পাড়ার রাজাকার ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কেমন হয়? কিছু

টাকা-পয়সা ওদের দিলে ওরা হয়তো লাশটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে পারে।'

'তা পারে, তবে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ না করাই ভালো, এক বান্দাও তো ভালো ঘরের কেউ নয়, রাস্তা থেকে কুড়োনো। আমি ওদের দেখলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিই। সব সময় দেড় হাত দূরে থাকা ভালো।' (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৭৫)

এছাড়াও এই গল্পে মানসিকভাবে শক্তিশালী, প্রত্যুৎপন্নমতি নারী মরিয়মের কাছে রাজাকারদের নতজানু হবার বিষয়টিও প্রকাশ পেয়েছে :

'মরিয়মের মারমুখী হাবভাবে একটু দমে যায় রাজাকারটি। সে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'না, একটা আইনের ব্যাপার তো।'

'আইনের তুমি জানটা কী, কর তো রাজাকারগিরি'–মরিয়ম খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'আমাদের সাহেব অফিস থেকে আর্মিকে টেলিফোন করবে। নাকের ডগায় একটা রাজাকার ক্যাম্প, অথচ ভদ্রলোকের বাড়ির পাশে একটা বেওয়ারিশ লাশ পড়ে, স্রেফ তারা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। কেন, টেনে নিয়ে গিয়ে নদীতে ফেলে দেয়া যায় না?'

ছোকরা রাজাকারটি বলল, 'আমরা তো খবর পেয়েই এলাম।'

'সারারাত তোমরা কী করছিলে? পুলিশ-আর্মি তো আর ডিউটি মানে না? আর্মি এলে জবাবদিহি করতে পারবে তাদের সামনে? খুব ভালো করে চিনি তোমাদের। কান ধরে উঠবস করে রেহাই পাবে না তখন।' (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৭৭)

মুক্তিযুদ্ধকালীন সামগ্রিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে অনেককেই ব্যক্তিগত ফায়দা লুটতে দেখা যায়। আবার মুক্তিযুদ্ধের সময় হেন পরিস্থিতিতে মানুষ অন্যের ক্ষতি করতে যত ধরনের কূটচাল রয়েছে তার প্রয়োগ করে। 'বেওয়ারিশ লাশ' গল্পে মুরাদ বক্স তেমনি একটি চরিত্র। রায়েরবাজারে জমি কেনার পর থেকে জামশেদ চৌধুরীর সাথে মুরাদ বক্সের গোলমাল শুরু হয়। ফলে মুরাদ বক্স জামশেদ চৌধুরীকে নাজেহাল করার জন্য জামশেদ চৌধুরীর ঘরের পাশে একটি লাশ ফেলে দিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এসকল নৈতিক অবক্ষয় হর-হামেশাই দেখা গেছে। 'বেওয়ারিশ লাশ' গল্পে নৈতিক যে অবক্ষয় চোখে পড়ে তা হচ্ছে :

কিছু একটা ভেবে ছোকরা রাজাকারটি এগিয়ে এলো। তারপর চাপা গলায় বলল, 'মুরাদ বক্স কাজটা করেছে। লাশটা পড়ে ছিল রাস্তার ধারে, লোক ভাড়া করে শেষরাতে আপনাদের ঘরের পেছনে ফেলে গেছে।'

এই রায়েরবাজারে জমি কেনার পর থেকে মুরাদ বক্সের সঙ্গে গোলমাল শুরু। বহুবার বহুভাবে চেষ্টা করেছে মুরাদ বক্স জামশেদ চৌধুরীকে জব্দ করতে, কিন্তু পারেনি। বাড়ি তৈরির সময়ও লোক লাগিয়ে রাতের অন্ধকারে একবার এক পাশের একটা পাঁচিল ফেলে দিয়েছিল। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৭৮)

মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছু মানুষ খুব আত্মকেন্দ্রিকতার পরিচয় দিয়েছে। নিজের স্বার্থে যা কাজে লাগে তাই ভাল; আর বাকিটা খারাপ। জামশেদ চৌধুরী তেমনি লোক; রাজাকাররা লাশ সরিয়ে দিয়েছিল তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার মতই তরফদার তাকে লাশ সরাতে সাহায্য না

করাই তরফদার বিবেকহীন মনে হয়। অথচ সেই লাশটা সে নিজে থেকে সৎকারের ব্যবস্থাটাও পর্যন্ত করেনি। তাই মুক্তিযুদ্ধের সময় আত্মকেন্দ্রিক, ভীতু ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী শ্রেণির প্রতিভূ জামশেদ চৌধুরী সম্পর্কে গল্পকারের পর্যবেক্ষণ :

> ফুটোয় চোখ লাগিয়ে বসে থাকতে থাকতে তরফদারের ওপর তিনি ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠলেন, এক নম্বুরে আহম্মক, স্বার্থপর। পড়ে থাকত লাশটা নিজের ঘরের পাশে তো দেখা যেত কত গয়ংগচ্ছভাবে তুমি চলো। এই মুহূর্তে শিয়াল-কুকুর কিংবা রাজাকারগুলোর কাছে বরং নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে হয়, ওই লোকটা একেবারে বিবেকহীন। দেশ, দেশের লোক, সবকিছুর ওপরেই তিনি বীতশ্রদ্ধ, কোনো কিছুর ওপরই তার এখন ভক্তি নেই। (মাহমুদুল, ১৯৯৪ : ১৭৮-১৭৯)

পাঁচ.

মাহমুদুল হক মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিবেশের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত সৃষ্টিশীল গল্পকার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধকালীন চারপাশের স্পন্দন তাঁর গল্পকারসত্তাকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের অত্যাচারের বীভৎসতা, মানুষের মনোজগতে সর্বদা বিরাজমান জানমাল ও সম্ভ্রম রক্ষার ভয় ও আতঙ্ক, মানবিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর ছিন্নভিন্ন দশা, অসহায়ত্ব, গ্রাম ও শহরের সকল স্তরে শত্রুপক্ষের ভয়াল থাবা প্রভৃতি বিষয়গুলো উঠে এসেছে আলোচ্যমান তিনটি গল্পে। এছাড়াও দেশমাতৃকার বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা অপারেশনের পাশাপাশি নিগৃহীত হবার চিত্র গল্পকার সংযোজন অংশের তিন'টি গল্পে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির চরম ত্যাগ ও আবেগের বিষয়। কেননা মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অস্তিত্বের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। স্বভাবতই মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা ও তার স্পন্দনটি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক কিংবা গল্পকারদের প্রভাবিত করেছে। গল্পকার মাহমুদুল হকের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কেননা মাহমুদুল হকের ব্যক্তিজীবন মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনা ও চারপাশের পরিবেশের স্পন্দনটি *প্রতিদিন একটি রুমাল* গল্পগ্রন্থের সংযোজন অংশের তিন'টি গল্পে স্পষ্ট। গল্প তিনটিতে উপস্থাপিত মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গগুলো বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাঙালি পাঠককে মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ ও স্পন্দনটিকে অনুধাবনে যথেষ্ট সহায়তা করবে নিঃসন্দেহে।

সহায়কপঞ্জি

আবু হেনা মোস্তফা এনাম (২০২১)। *মাহমুদুল হক : সৃষ্টি ও শিল্প*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

মাহমুদুল হক (২০১৬)। *প্রতিদিন একটি রুমাল* (৪র্থ সংস্করণ)। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

আবু হেনা মোস্তফা এনাম (সম্পা., ২০২০)। *মাহমুদুল হক রচনাবলি* (প্রথম খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মফিদুল হক, আবুল হাসনাত, আবু হেনা মোস্তফা এনাম (সম্পা., ২০১০)। *আলোছায়ার যুগলবন্দি, মাহমুদুল হক স্মরণে*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

রশীদ করীম (১৯৮৯)। *আর এক দৃষ্টিকোণ, মাহমুদুল হক-এর উপন্যাস*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।